লোধা : সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

সৌমিতা মিত্র

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্র ধরে ভারতের কতগুলি শ্রেণি ও সমাজের নতুন নামকরণ হয়েছে। পূর্বের আদিম অধিবাসীরাই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় আদিম আদিবাসী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আধুনিক জগৎ থেকে আজও আদিবাসীরা অনেকটাই দূরে সরে রয়েছে। আজও পর্যন্ত আর্য ভারত ও আদি ভারত সমন্বিত হতে পারেনি। ভারতের আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক আধুনিক ভারতীয়ই অজ্ঞাত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোথাও এই আদিবাসীরা প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে অচল হয়ে আছে। কোথাও এরা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হারাতে বসেছে, আবার কোথাও এরা নিজেদেরকে আধুনিক রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা পরিবর্তনকে বরণ করে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে আধুনিকতার সঙ্গে অমিল থাকলেও আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র থেকে এরা পুরোপুরি দূরে সরে নেই। বাংলায় বসবাসকারী অসংখ্য আদিবাসীর ন্যায় একটি আদিম অধিবাসী হল লোধা, যাদের মেদিনীপুরে বিশেষভাবে দেখা যায়। আমি মূলত লোধা জনগোষ্ঠী সম্পর্কেই একটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ পরিবেশন করব। আমি মূলত আমার প্রবন্ধটিতে লোধা জনগোষ্ঠীর জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

লোধারা পূর্ব-ভারতে বিশেষ করে উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি আদিম জনগোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-মেদিনীপুর, পূর্ব-মেদিনীপুর, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা, বিহারের কোনো কোনো স্থানে এবং ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলায় এদের সংখ্যা অধিক। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোধারা অন্যতম। অনেক বছর ধরে লোধারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে। যদিও সভ্যতার অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনে আধুনিকতার আলোক সেইভাবে প্রবেশ করেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আজও অনগ্রসরতার তিমিরেই রয়ে গেছে।

লোধারা কোনো অঞ্চলে পৃথকভাবে বসবাস করে আবার কোথাও অন্যান্য অধিবাসী যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি একই গ্রামে বাস করে থাকে। তাদের দেহ ত্বক বর্ণ ঘন বাদামী, ঢেউ খেলানো চুল এবং দৈহিক উচ্চতা মাঝারি আকৃতির। মাথা লম্বা অথবা চওড়া। লোধাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। এরা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। উড়িষ্যার নীলাচলের শবর রাজা বিশ্ববসুরের বংশধর বলে এরা নিজেদের পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ সরকার এদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের হেতু এদের 'অপরাধপ্রবণ উপজাতি' বলে নির্ধারণ

করেছিল। যদিও বর্তমানে সেই কলঙ্ক থেকে লোধারা মুক্ত। অতীত জীবনে কোনও একসময় বাঁচার তাগিদে এরা নানারকম অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য দেশের বিদেশি শাসক তাদের অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে। স্বাধীনতার পর লোধারা সাধারণ তফসিলি আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে আজও কোন কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। যদিও বর্তমানে লোধাদের অপরাধপ্রবণ ও ছন্নছাড়া জীবনধারার গতি পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

লোধারা বরাবরই ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বন সংরক্ষণ আইন চালু হবার পর এদের যথেচ্ছ জঙ্গলের বিচরণ এবং ফলমূল, গাছ-গাছড়া সংগ্রহে নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় লোধারা সংগ্রহকারীর জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে পরিস্থিতি প্রতিকূলতার কারণে লোধারা আদিম জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়েছে। যদিও কৃষিকাজে এরা কোনোদিনই পারদর্শী নয়। লোধারা শিকার, চাষবাসের ক্ষেত্রে দা, কাস্তে, কোদাল, টাঙ্গি, লাঙল, তীর-ধনুক, প্রভৃতি ব্যবহার করে।

পান্তাভাত এদের প্রিয় খাদ্য। খাবার না জুটলে জঙ্গলের পাতা সেদ্ধ করেই এদের খেতে হয়। ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া ও মহুয়ার মদ এদের প্রিয় খাদ্য। লোধাদের ঘর-বাড়ি সাধারণ মাটির তৈরি। ঘরগুলি আকারে ছোটো, ঘরের কাঠামো হয় খড় অথবা জঙ্গলের পাতা, বাঁশ দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরের কোনও জানলা থাকে না। উন্নত কৃষিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়া লোধাদের একাধিক কামরাবিশিষ্ট ঘর দেখা যায়। পাশাপাশি অথবা বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলি লোধা-পরিবার যখন থাকে তখন একটি গ্রাম বা পাড়া তৈরি হয়। প্রতিটি গ্রামে সার্বজনীন 'বড়াম' ঠাকুরের থান, চণ্ডী ও শীতলার থানও থাকে।

লোধা পুরুষেরা মোটা ধুতি ও গামছা এবং মেয়েরা মোটা শাড়ি ব্যবহার করে পরিধেয় হিসেবে। বর্তমানে লোধা মেয়েদের মধ্যে কাঁচের চুড়ির প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের মধ্যে পুঁতির হার এবং নানারকম অলঙ্কার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেহে উল্কি অঙ্কন লোধা মেয়েদের খুব প্রিয়। সারা বছর লোধারা নানা উৎসব অনুষ্ঠানে মেতে থাকে। এদের গৃহস্থালীর আসবাবপত্র খুবই কম থাকে। বর্তমানে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যম হিসাবে আধুনিকতার চিহ্নস্বরূপ এরা দেশলাইয়ের ব্যবহার করে।

লোধা সমাজ কতগুলি গোত্রে বিভক্ত। সকল গোত্রেই বহির্বিবাহ প্রচলিত আছে এবং সকলেরই নিজস্ব গোত্র আছে। এরা গোত্র দেবতাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। এদের সর্বমোট নয়টি গোত্র দেখা যায়—ভজা, কোটলি, মল্লিক, নায়েক, পারমানিক, দিগার, দণ্ডপাট, আড়ি এবং ভুঁইয়া। লোধারা তাদের গোত্রদেবতাকে ভক্ষণ করে না। গোত্রের মধ্যে সামান্য উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। লোধাদের গোত্র পিতৃ-কেন্দ্রিক। মেয়েরা বিবাহের পর পরগোত্র গ্রহণ করে।

পরিবার লোধা সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে প্রাথমিক পরিবারের সংখ্যা বেশি। এছাড়া বহুপত্নীমূলক ও যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। পরিবারই প্রধান অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। শ্রমবিভাজন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিচালনায় পরিবারের

ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত লোধারা একবার বিবাহ পছন্দ করে। তবে বহুবিবাহ প্রথাও দেখা যায়। বিবাহবিচ্ছেদ লোধা সমাজে স্বীকৃত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী পুত্রসন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিবাহিত মেয়েরা কোনও সম্পত্তির দাবিদার হয় না।

লোধা সমাজে সাধারণভাবে অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১০ টাকা—১৫ টাকা পর্যন্ত কন্যাপণ দেবার রীতি আছে। ছেলেদের ১৫—২৫ এবং মেয়েদের ১০—১৫ বছরের মধ্যেই বিবাহ হয়। পুরোহিত বা দেহরী বিবাহ কালে উপস্থিত থেকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানায়। লোধাদের মধ্যে সময় বিশেষে গান্ধর্ব বিবাহ, শ্রম বিবাহ সম্পন্ন হয়। সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বিধবা অথবা স্বামী-পরিত্যাজা রমণীকে বিবাহকে 'সাঙ্গা' বলা হয়। লোধাদের সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু থাকে না।

লোধাদের গ্রামে পঞ্চায়েত-এর অস্তিত্ব আছে। পঞ্চায়েত গ্রামের সামাজিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পঞ্চায়েতের সদস্যরা নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত হয়। তবে পঞ্চায়েতের সদস্য পদে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। মুখিয়া অর্থাৎ গ্রামের প্রধান, ডাকুয়া অথবা বার্তাবাহক, পরমানিক বা অনুষ্ঠানের পাচক—এই তিন সদস্য পঞ্চায়েত গঠনে অংশগ্রহণ করে।

পঞ্চায়েতের সংগঠক হিসেবে এরা প্রত্যেকেই বিশেষ সম্মানের অধিকারী। পঞ্চায়েত গ্রামের সব সমস্যার নিষ্পত্তি করে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচারে ব্যবস্থা করে দোষীকে শাস্তি প্রদানও লোধা সমাজে প্রচলিত। এক্ষেত্রে বিচারকালে সাক্ষী গ্রহণের রীতিও দেখা যায়। দোষীকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির প্রথা প্রচলিত।

প্রত্যেক আদিবাসী সমাজেরই নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। যে সংস্কৃতি পুরোপুরি একে অপরের সংস্কৃতি অপেক্ষা পৃথক। লোধাদের আচার অনুষ্ঠান এবং লোধাদের মেয়েদের হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রমাণ মেলে। তারা নানা দেবদেবী ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা, দুর্ঘটনা, রোগ, ব্যাধি অপার্থিক শক্তির কোপেই ঘটে থাকে। তারা দেবতায় বিশ্বাসী, তাঁকে তারা সৃষ্টির সর্বময় বলে মান্য করে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড়াম। বসুমাতা পৃথিবীর দেবী, সত্য ও পুণ্য কর্মাবলীর জন্য রয়েছে ধরম দেবতা। এছাড়া শীতলা ও চণ্ডী দেবতার পুজো করে থাকে লোধারা। নানাধরনের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী হওয়ায় ভূতদের প্রধান যুগিনী। এছাড়া আছে প্রেতসিনি, গোমুয়া, কুন্দরা প্রভৃতি। ধর্মীয় জগতে কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন দেহেরী বা পুরোহিত। তালিয়া বা সহকারী পুরোহিত এবং হন্তকার বা উৎসর্গকারী। এছাড়া রয়েছে গুণীন বা ওঝা। নানারকম রোগের চিকিৎসার জন্য গুণীন বা ওঝার উপরই নির্ভর করা হয়। রোগ নিরাময়ে ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, জলপড়ার মতো অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারমনস্কতা যুক্ত ক্রিয়াকলাপ লোধাদের জীবনের অঙ্গস্বরূপ। জঙ্গলের গাছগাছড়ার মূল থেকে তৈরি ওষুধ লোধাদের রোগ নিরাময়ের বিশেষভাবে কাজে লাগে বলে তাদের ধারণা। তবে বর্তমানে তাদের সমাজে কিছু মানুষ শিক্ষিত হওয়ায় তাদের এই চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বেশীরভাগ লোধাদের কাছে এই ওষুধ এখনও রোগ নিরাময়স্বরূপ। লোধাদের নানা দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠানে, নানা প্রথাতেও হিন্দু রীতির ছাপ বিদ্যমান। তবে আদিম সমাজের ন্যায় লোধাদের নিজস্ব কিছু

রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠান আছে, যা তাদেরকে হিন্দু তথা অন্যান্যদের থেকে পৃথক সত্ত্বা প্রদান করেছে।

লোধাদের বিশ্বাস যে, তাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা মৃত আত্মা নিয়ন্ত্রণে আনায় পারদর্শী। শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে সেভাবে এখনো পর্যন্ত না পৌঁছানোয় তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যা তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তারা পরজন্মের ধারণাতেও বিশ্বাসী। তাদের ভুত-প্রেত, আত্মা থেকে একমাত্র দেবতারাই রক্ষা করতে পারে। আত্মা সম্পর্কে লোধাদের মধ্যে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। তাদের ধারণা মৃত্যুর পর দেহ থেকে আত্মা নির্গত হয়ে নিকটবর্তী গাছ, বাড়ি, জঙ্গলে বসবাস করে। পরবর্তীকালে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই মৃত আত্মা আবার ফিরে আসে। মহিলা বা পুরুষকে ডাইনী সন্দেহে গ্রাম থকে বহিষ্কার করার ঘটনাও লোধা সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনের থেকে মুক্তির স্বাদের জন্য লোধারা মাঝে মাঝে নানারকম বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে খেলাধূলার আয়োজন করে। বিনোদনের অপর মাধ্যম হল নাচ গান। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নৃত্য-গীতের প্রচলন আছে। আজও লোধা সমাজে লোকগাথা প্রচলিত। লোধা সঙ্গীতে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

লোধা পুরুষ, মহিলা উভয়ই দিনগত মজুরীর কাজে অংশগ্রহণ করে। সারাবছর এরা নানা উৎসব অনুষ্ঠানে মেতে থাকে। কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজেদের বাঁচার তাগিদে, আবার কখনও পূর্বপুরুষদের মৃত আত্মার মঙ্গল কামনায়, আবার কখনও নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানা দেবদেবী ও আমতার উপাসনা করে থাকে। প্রত্যেক লোধা গ্রামেই দেবতার আরাধনার স্থান থাকে, যাকে স্থানীয় অর্থে 'মারো' বা 'থান' বলা হয়। লোধারা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পুজো করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তাদের ধারণা শীতলা দেবীর পূজা করলে কলেরা রোগ নিরাময় সম্ভব। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ড্রাম বা চাঙ্গাল বাজিয়ে নৃত্য-গীতের আয়োজন করা হয়। লোধা সমাজে 'বারোমাসি' প্রধান গান হিসাবে পরিচিত। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষার তাগিদে চণ্ডী পুজো করা হয়। এছাড়া মনসা, কালী প্রভৃতি দেবীর উপাসনা করা হয়ে থাকে। ভালো শস্য উৎপাদনের আশায় তারা জাঠেল উৎসব পালন করে থাকে। তবে লোধাদের পালিত বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে প্রধান পৌষ সংক্রান্তিতে পালিত হওয়া উৎসব 'টুসু' এবং কার্তিক মাসে 'গো-বন্দনা' উৎসব।

লোধারা মৃত্যুকে জীবনের একটি স্বাভাবিক পর্যায় বলে মনে করে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কাজের সঙ্গে হিন্দুদের রীতির সাদৃশ্য বিদ্যমান। শিশুর মৃতদেহকে লোধারা সর্বদাই কবর দেয় এবং সংক্রমণ ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটলে কবর দেওয়াই প্রথা। মৃত্যুর পর নিয়মরীতি পালন ও সৎকারের ক্ষেত্রেও লোধাদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মনে করা হয় যে, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে এরকম সাদৃশ্যতা দেখা যায়। তবে তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে লোধা সমাজের পৃথক বৈশিষ্ট্যের ন্যায় নিজস্ব রীতিনীতি।

১৮৭১ খ্রি. ব্রিটিশ সরকার 'Criminal Tribes Act' পাশ করে। বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ কার্যকলাপের জন্য সরকার লোধা জনগোষ্ঠীকে ১৯১৬ খ্রি. অপরাধপ্রবণজাতি হিসাবে ঘোষণা করেছিল। লোধারা অতীতে বিভিন্ন নামযুক্ত ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ডাকাতি, চুরি

প্রভৃতি অপরাধপ্রবণ কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকতো। তবে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং অশিক্ষাই ছিল অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবার প্রধান কারণ। তবে সরকার লোধাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে অনেক লোধা নারী-পুরুষই শিক্ষার আলো দেখেছে। তারা কার্যসূত্রে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সরকারি আনুকুল্যে লোধাদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমানে বিস্তার লাভ করেছে। তবে লোধাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদের বসবাসের এলাকাগুলি পরিদর্শন এবং তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীলভাবে যোগাযোগের প্রয়োজন।

১৯৫৪ খ্রি. থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে লোধাদের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি অর্থানুকূল্যে দেশের বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান লোধাদের উন্নয়নে অগ্রসর হয়েছে। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হরিজন সেবক সঙ্ঘ, ভারত সেবক সঙ্ঘ, সমাজসেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি। লোধাদের পশুপালনে উৎসাহ প্রদান, গৃহাভিমুখী করা এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত করতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবে বনজঙ্গলে স্বাধীনভাবে বিচরণকারী, খাদ্যান্বেষণকারী লোধাদের কৃষিকাজে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দিয়েছে। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় ডহরপুরে বিদিশা গ্রামে নির্মিত উপনিবেশে বহু লোধা পরিবার পুর্নবাসন লাভ করেছে। এখানে অভিজ্ঞ নৃ-বিজ্ঞানী ও সার্থক সমাজসেবীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে লোধা আদিবাসী উন্নয়ন এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. Binoy Ghosh : 'Paschim Banger Sanskriti' Part-I. P.P.–201-03, Prakash Bhawan.
2. N.K. Bose : 'Some Indian Tribes' Kolkata, 1972
3. P. K. Bhowmick : 'Some aspects of Indian Anthropology' Kolkata, 1980.
4. P.K. Bhowmick : 'The Lodhas of West Bengal', Kolkata, 1963
5. R.M. Sarkar : 'Denotified Tribes' New Delhi, 1961
6. R.M. Sarkar : 'Sedenterization of the Nomadic Community in Vanajati', Vol-34, No. 1, 1986
7. R.M. Sarkar : 'নৃবিজ্ঞান প্রবেশিকা', নলেজ হাউস, কোলকাতা, ২০০৭
8. N.K. Bose : 'Cultural Anthropology and their other essay' Calcutta, 1953
9. সুবোধ ঘোষ : 'ভারতের আদিবাসী', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৯৪
10. হিমাংশুমোহন রায় : 'ভারতের আদিবাসী', মণ্ডল এন্ড সন্স, কোলকাতা ১৯৮০
11. Mahasveta Devi : 'Lodhas of West Bengal : II', Economic and Political Weekly, Vol-18, No. 23, P.P. 997-998, 1983
12. D. C. Pal and S. K. Jain : 'Lodha Medicine in Midnapur Dist', Springer, P.P. : 464-470, 1989
13. P.C. Roy : 'The Lodha and their spirit possessed man', Anthropological Survey of India, 1965